আল্লামা রাহ্‌মাতুল্লাহ কীরানবী: জীবন ও কর্ম

ড: খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত এ প্রবন্ধটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত

১. জন্ম ও বংশ

মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ কীরানবী ১২৩৩ হিজরি সালের জুমাদাল উলা মাসের ১ তারিখ, মোতাবেক ১৮১৮ খৃস্টাব্দের মার্চের ৮/৯ তারিখে ভারতের রাজধানী দিল্লীর পার্শ্ববর্তী 'মুজাফ্‌ফর নগর' জেলার 'কীরানা' বা 'কৈরানা' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খলীলুর রহমান। তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ যুন্‌-নূরাইন 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফানের (রা) বংশধর। তাঁর ২৪তম পিতামহ 'আব্দুর রাহমান ইবনু 'আব্দুল 'আযীয সর্বপ্রথম সুলতান মাহমূদ গযনবীর সাথে ভারতে আগমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি পানিপথে স্থায়ীভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর ৭ম পিতামহ আব্দুল কারীম একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ভারতের মোগল সম্রাট আকবরের এক জটিল রোগের চিকিৎসায় তিনি সফল হন। পুরস্কার হিসেবে সম্রাট আকবর তাকে 'কৈরানা' গ্রামে অনেক লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। তখন থেকে তাঁরা তথায় বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তী মোগল শাসনামলে এ বংশের অনেকেই বিভিন্ন বড় বড় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১]

২. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন

রাহমাতুল্লাহর পিতা, চাচা ও বংশের অনেকেই ছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের অন্যতম। ইলম, ধার্মিকতা, সম্পদ ও প্রতিপত্তি সবদিক থেকেই তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের হাতেই রাহমাতুল্লাহর হাতেখড়ি। ১২ বৎসর বয়সে তিনি 'হিফযুল কুরআন' (কুরআন কারীম মুখস্থ) সম্পন্ন করেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করেন এবং তিনি আরবী, ফার্সী ও উর্দু তিনটি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

এরপর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী দিল্লী গমন করেন। তথায় প্রসিদ্ধ 'আলিম মুহাম্মাদ হায়াতের 'মাদ্‌রাসা' (মহাবিদ্যায়ল[২])-এ ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় ও দিল্লীর অন্যান্য 'আলিমের নিকট ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষার আগ্রহ রাহমাতুল্লাহকে এখানেই থামতে দেয় নি। দিল্লীর 'আলিমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করার পরে তিনি লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ইসলামী জ্ঞানের চর্চায় লক্ষ্ণৌও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ আলিম ও ফকীহ মুফতী সা'দুল্লাহর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। ইমামবখশ সাহবায়ীর নিকট ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মুহাম্মাদ ফায়েযের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এছাড়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট গণিত-শাস্ত্র ও প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন করেন।

এভাবে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ-এর শিক্ষক ও পণ্ডিতদের নিকট থেকে ইসলামী ও প্রচলিত শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভের পরে রাহমাতুল্লাহ তাঁর জন্মস্থান কৈরানায় ফিরে আসেন। তথায় তিনি একটি মাদরাসা (মহাবিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে মেধাবী ছাত্ররা তার মাদরাসায় ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভ করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে ইসলামী শিক্ষা প্রচার, খৃস্টধর্ম-প্রচারকদের বিভ্রান্তি প্রতিরোধ ও বৃটিশ আধিপত্য বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন এবং অনেকেই তাঁদের লিখনী, বক্তব্য ও শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম জাগরণ ও প্রতিরোধ আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। এদের একজন ছিলেন আল্লামা শাইখ 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব। তিনি মাদ্রাজের প্রথম ইসলামী মহাবিদ্যালয় (মাদ্রাসা) 'আল-বাকিয়াতুস সালিহা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাদ্রাজের সবচেয়ে বড় ইসলামী শিক্ষাপীঠ বলে গণ্য।[৩]

৩. ভারতের তৎকালীন অবস্থা ও মিশনারি অপ-তৎপরতা

---

[১] ড. মালকাবী, মুহাম্মাদ আহমাদ, সম্পাদকের ভূমিকা, ইযহারুল হক্ক (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ: দারুল ইফতা, ১৯৮৯) ১/১৫; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, ভূমিকা, ইযহারুল হক্ক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ২/৫-৬; ড. মোহর আলী, মুওয়াজাহাতুল মুসলিমীন লিল আনশিতাতিত তানসীরীয়্যাহ ফিল বানগাল ওয়া শিমালিল হিনদ (প্রবন্ধ), গবেষণা কেন্দ্র, আল-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাৎসরিক জার্নাল, ১ম সংখ্যা, মুহাররাম ১৪০৩ (১৯৮২), পৃ. ৮০।

[২] তৎকালীন মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় মসজিদ ও মকতবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা হতো। আর মাদ্রাসা ছিল উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র। বর্তমান পরিভাষায় যা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য। ইউরোপে 'স্কুল' শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হতো ও এখনো হয়ে থাকে।

[৩] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/১৬; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত, ২/৬-৭।

www.assunnahtrust.com

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার পতন ছিল ইসলাম ও খৃস্টধর্মের ইতিহাসের একটি মোড়। ইসলামের সাথে খৃস্টধর্মের প্রতিযোগিতা ও সংঘাত প্রথম থেকেই। প্রথম থেকেই ইসলামের পাল্লা ভারী থেকেছে। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগে খৃস্টীয় ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১০৯৫ খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ ক্রুসেড নামের মহা-সমর ও মহা-ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন নি, যদিও ক্রুসেডার নেতৃবৃন্দের অনেকেই প্রাথমিক বিজয়ের পরেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফল হয়েছিল উল্টো। অটোমান তুর্কীগণ ক্রমান্বয়ে ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। এছাড়া দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে।

খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকে অটোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতার পাশাপাশি ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় খৃস্টানগণ একটি মুসলিম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। খৃস্টান প্রচারকগণ একে খৃস্টধর্মের মহাবিজয়ের সূচনা বলে গণ্য করেন। তারা অনুভব করেন যে, অচিরেই ইসলাম বিলুপ্ত হবে এবং খৃস্টধর্ম তার স্থান দখল করবে। বিপুল উদ্দীপনার সাথে তারা ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও খৃস্টধর্ম প্রচারের দিকে এগিয়ে আসেন। একদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্রমান্বয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। অপরদিকে ক্রমান্বয়ে খৃস্টান মিশনারিগণ ভারতে আগমন করতে থাকেন। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি (Willian Carey) ব্যাপটিস্ট মিশনারির পক্ষ থেকে কলকাতায় আগমন করেন। অষ্টাদশ শতক শেষ হওয়ার আগেই মিশনারি কার্যক্রম সুনির্ধারিত রূপ লাভ করে। এ শতক শেষ হওয়ার আগেই ভারতে খৃস্টধর্ম, বিশেষত ইংল্যান্ডের চার্চের নিয়ন্ত্রণে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রচারের জন্য বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলির মধ্যে ছিল:

১. The Baptist Missionary Society (ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি)
২. The Church Missionary Society (চার্চ মিশনারি সোসাইটি)
৩. The London Missionary Society (লন্ডন মিশনারি সোসাইটি)
৪. The Free Church of Scotland Mission (স্কটল্যান্ডীয় ফ্রী চার্চ মিশন)
৫. Society for the Propagation of the Gospel (গসপেল প্রচার সোসাইটি)

এ সকল প্রচারক সমিতি ও সংস্থাকে অর্থ, সম্পদ, প্রচারক, রাজনৈতিক সমর্থন ও বই-পুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বৃটিশ ও বিদেশী বাইবেল সোসাইটি (British and Foreign Bible Society) গঠন করা হয়। এছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ও ব্রিটেনের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় হিন্দু ও মুসলিমদেরকে যেকোনোভাবে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে অতি-আগ্রহী ছিলেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা ইংল্যান্ডে বিশেষভাবে প্রচার করেন। ফলে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উগ্রতার ভিতর দিয়ে বাংলা ও ভারতে খৃস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয়।[৪]

ধর্মান্তকরণের এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। অগণিত মিশনারি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত করা, মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি জবরদখল করা, 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নামে মূল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা অপসারণ করা, ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম বিরোধী বিকৃত তথ্যাদি উপস্থাপন করা, মুসলিমদের মধ্য থেকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও অন্যান্য ভণ্ড ও প্রতারককে সাহায্য করে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা ইত্যাদি। তবে, সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় ছিল বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ইসলাম ধর্ম, কুরআন কারীম ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য বিভিন্ন পুস্তক রচনা করে মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা, প্রকাশ্যে সকল মুসলিমকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য নিয়মিত জোরালো দাবি জানানো, এজন্য ব্যক্তিগতভাবে চাপাচাপি করা এবং মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বহস, বিতর্ক ইত্যাদির চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া।[৫]

এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলা ও ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবাধীন সকল অঞ্চলে খৃস্টান মিশনারিগণ জনসমাবেশ, বাজার, মসজিদ, মাদ্রাসা ও সকল জন-সমাগম স্থানে প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার, বই-পুস্তক বিতরণ ও মুসলিম আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন। তাদের মিথ্যাচার ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম দিকে কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। পাদরিগণ এদের নামের আগে মৌলবী, শেখ ইত্যাদি লাগিয়ে এদের মাধ্যমে তাদের অপপ্রচারের ধারা আরো জোরদার করতে চেষ্টা করেন। অনেক সময় কিছু কথা বলার পরে পাদরিগণ সাধারণ মানুষকে জোর করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। বিশেষত যখন সাধারণ মানুষেরা ইসলাম ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের অপ-প্রচারের জবাব দিতে অক্ষম হতেন তখন পাদরিরা তাদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে পীড়াপীড়ি করতেন।[৬]

ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার আরো জোরালো হয় মি. ফান্ডারের আগমনের পরে। মুসলিম বিশ্বে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক তৈরি ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে "Basel Missionary Seminary" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে খৃস্টধর্মীয় ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়াদির পাশাপাশি আরবী ভাষা, কুরআন,

[৪] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭১।
[৫] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত ১/১৩-১৫।
[৬] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭৭; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/৭।

www.assunnahtrust.com

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক পড়ানো হতো। কার্ল গোটালেব ফান্ডার (Carl Gottaleb Pfander) ১৮২৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে কিছু দিন রাশিয়ার জর্জিয়া ও পারস্যে খৃস্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। এ সময়ে তিনি ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন। ১৮২৯ সালে তিনি তার 'মীযানুল হক্ক' (Scale of Truth) বা 'সত্যের মাপদণ্ড' নামক গ্রন্থটি জার্মান ভাষায় রচনা করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টান পাদরিগণের গতানুগতিক মিথ্যাচার, তথ্যবিকৃতি, অপপ্রচার ও বিষোদ্গার তিনি এই পুস্তকে একত্রে সংকলন করেন। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে তিনি বইটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি ফার্সী ভাষায় পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি একই উদ্দেশ্যে ও পদ্ধতিতে ফার্সী ভাষায় 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) ও 'তরীকুল হায়াত' (জীবনের পথ) নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে রুশ সরকার জর্জিয়ায় মিশনারি কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। তখন মি. ফান্ডার বাসেলে ফিরে যান এবং ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তার আগমনের ফলে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার তুঙ্গে উঠে। তিনি তার পুস্তকগুলি উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ভারতের মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন। এছাড়া মৌখিক প্রচার ও বিষোদ্গারের ধারা অব্যাহত থাকে।[৭]

৪. মিশনারি অপ-প্রচারের প্রতিরোধে শাইখ রাহমাতুল্লাহ

ভারতীয় মুসলিমদের এই দুর্দিনে যে সকল মুসলিম মনীষী মিশনারি অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কলম তুলে নেন তাদের অন্যতম ছিলেন শাইখ রাহমাতুল্লাহ। খৃস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের ব্যাপকতা, গভীরতা ও উগ্রতায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে তিনি তার অধ্যাপনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে লিখনি, ভাষণ ও বিতর্কের মাধ্যমে মিশনারিদের প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইংরেজি, আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় লিখিত খৃস্টধর্ম সম্পর্কীয় মৌলিক গ্রন্থাদি ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ডা. উযির খান নামক একজন মুসলিম চিকিৎসক এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সহযোগিতা করেন। উযির খান বিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলার মুর্শিদাবাদে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এসময়ে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ও সর্বত্র খৃস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে বিচলিত হন। ত্রিশের দশকে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেন। তিনি ইংরেজি ও গ্রীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থানের সুযোগে তিনি ইংরেজি ভাষায় রচিত খৃস্টধর্ম ও বাইবেল বিষয়ক সমকালীন গবেষকদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করে ভারতে নিয়ে আসেন। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে ছিল:

(১) T. H. Horne রচিত An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scripture.
(২) D. F. Strauss রচিত The Life of Jesus
(৩) Nathaiel Lardner রচিত The Credibility of Gospel History
(৪) G. D'Oyley and R. Mant রচিত Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible
(৫) M. Henry and T. Scot রচিত A Commentary Upon the Holy Bible.

১৮৩২ সালে তিনি লন্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পরে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পরে তিনি আগ্রার মেডিকেল কলেজে ফার্মাকোলোজির (Pharmacology) উপরে অধ্যাপনা করতে থাকেন। মিশনারিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে রাহমাতুল্লাহ কীরানবীর প্রচেষ্টা তাকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁকে তাঁর নিকট সংগৃহীত তথ্য ও পুস্তকাদি দিয়ে সহযোগিতা করেন। এ সকল তথ্য ও পুস্তক রাহমাতুল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। তিনি মিশনারিদের অপ-প্রচারের প্রতিবাদে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। ১৮৫২ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ৫ বৎসরে তিনি উর্দু, ফার্সী ও আরবী ভাষায় অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি প্রমাণ করে যে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের বিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল অতুলনীয়। তিনি সন্দেহাতীতভাবে এ বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[৮]

কলম-যুদ্ধ ছাড়াও তিনি খৃস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে মুসলিম প্রচারকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রচারকগণ পরবর্তীকালে খৃস্টান মিশনারিদের অপপ্রচার প্রতিরোধে, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ও ইসলাম প্রচারমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখেন। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষদের মধ্যে এ বিষয়ে ওয়ায ও আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন।

এ সকল খেদমতের পাশাপাশি তিনি প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যমে খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচার রোধের পদ্ধতি গ্রহণ করেন। খৃস্টধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অহঙ্কারে আক্রান্ত ছিলেন খৃস্টান প্রচারকগণ। তারা সর্বস্তরের মুসলিমদের কাছে প্রকাশ্যে প্রচার করতেন যে, মুসলিম আলিমগণ তাদের সাথে বিতর্কে নামতে সাহস পান না। বিতর্ক হলে তারা কখনোই জয়লাভ করতে পারবেন না। তাদের সামনে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা কোনো মুসলিম আলিমের নেই... ইত্যাদি। এ সকল অপপ্রচার সাধারণ মুসলিমদের

[৭] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮০।
[৮] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

www.assunnahtrust.com

মনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছিল। রাহমাতুল্লাহ অনুভব করলেন যে, এ নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে প্রকাশ্য বিতর্কই সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। এজন্য তিনি মি. ফান্ডার-সহ ভারতের শীর্ষস্থানীয় সকল পাদরি ও প্রচারককে পত্রের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ পেশ করেন। তিনি খৃস্টান পাদরিদের সাথে একাধিক প্রকাশ্য বিতর্কে লিপ্ত হয়ে জয়লাভ করেন। তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ছিল মি. ফান্ডারের সাথে তার বিতর্ক।[৯]

মি. ফান্ডার আগ্রা ও উত্তর ভারতের ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত সকল এলাকায় খৃস্টধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। তিনি হাট-বাজার, মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন জনসমাবেশে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপ-প্রচার চালাচ্ছিলেন এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে খৃস্টধর্ম গ্রহণের জোর দাবি জানাচ্ছিলেন। আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তাকে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ গ্রহণের জন্য পত্রের মাধ্যমে আহ্বান জানান। ২৩ শে মার্চ ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে তাদের পত্রালাপ শুরু হয় এবং ৮ই এপ্রিল তা শেষ হয় এবং বিতর্কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মি. ফান্ডারের পত্রাবলি থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন কঠিন শর্ত জুড়ে বিতর্ক এড়াতে চেষ্টা করেন। এ সকল শর্তের মধ্যে ছিল, যে পক্ষ হেরে যাবে তাকে অন্য পক্ষের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। যদি মি. ফান্ডার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। আর যদি আল্লামা রাহমাতুল্লাহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন তবে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। রাহমাতুল্লাহ সকল শর্ত মেনে নিয়েই বিতর্কে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে বিতর্কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উভয় পক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিতর্ক অনুষ্ঠানে মি. ফান্ডারকে সহযোগিতা করবেন পাদরি মি. ফ্রেঞ্চ (T. V. French)। মি. ফ্রেঞ্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে মিশনারি কাজে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে আগমন করেন। তিনি আগ্রায় মি. ফান্ডারের সাথে কর্মরত ছিলেন। অপরপক্ষে শাইখ রাহমাতুল্লাহকে সহযোগিতা করবেন ডা. উযির খান।

উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে, আকবারআবাদ বা আগ্রার খৃস্টান মিশনারি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ সোমবার থেকে বিতর্ক শুরু হবে এবং নিম্নের ৫টি বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে:

(১) রহিতকরণ, অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের ফলে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের বিধান রহিত হওয়ার বিষয়
(২) বাইবেলের বিকৃতি
(৩) যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ
(৪) কুরআনের অলৌকিকত্ব
(৫) মুহাম্মাদ (ﷺ) এর নবুয়ত

বিতর্ক অনুষ্ঠানে ফয়সালা দানের জন্য নিম্নের ৫ জনকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, খৃস্টানদের পক্ষ থেকে ৩ জন ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে দুজন:

(১) আগ্রা হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতি মি. মোসলি স্মিথ (Mosley Smith)
(২) রাজ্য কোষাগারের সেক্রেটারি মি. জর্জ ক্রিস্টিয়ান (George Christian)
(৩) আগ্রার গভর্ণরের সেক্রেটারি মি. উইলিয়াম মূর (William Muir)
(৪) মুফতি রিয়াযুদ্দীন
(৫) আগ্রার উর্দু পত্রিকার সম্পাদক মুনশী খাদেম আলী[১০]

পাঁচ শতাধিক মুসলমান, হিন্দু, বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ও সাংবাদিকগণের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম দিনের বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'রহিতকরণ ও বিকৃতি'। খৃস্টান পাদরিগণ সর্বদা দাবি করেন যে, ঈশ্বরের বাণী বা বিধান কখনো রহিত বা পরিবর্তিত হতে পারে না। একবার ঈশ্বর যে বিধান প্রদান করেন পরবর্তী সময়ে কখনোই তা রহিত হতে পারে না। কারণ, এতে ঈশ্বরের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত বা কিতাবের বিধান পরবর্তী শরীয়তে রহিত হতে পারে। এ রহিতকরণ অজ্ঞতা নয়, বরং পূর্ণতা। বিশ্বাস, সংবাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো রহিতকরণ হয় না। তবে যুগ ও মানব সমাজের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আদেশ-নিষেধ বিষয়ক কোনো ব্যবস্থা রহিত হতে পারে। প্রথম দিনে এ বিষয়েই বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ক শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গী ডা. উযির খানের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁরা খৃস্টানদের বিশ্বাস ও বাইবেলের বিভিন্ন উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ঈশ্বরের পূর্ববর্তী বিধান পরবর্তী বিধান দ্বারা রহিত হতে পারে এবং হয়েছে। এক পর্যায়ে মি. ফান্ডার ও মি. ফ্রেঞ্চ নীরব হয়ে যান এবং 'রহিতকরণ'-কে 'পূর্ণকরণ' বলে অভিহিত করেন। তখন ডা. উযির খান বলেন, সাধারণভাবে পাদরিগণ এবং বিশেষভাবে আপনি মি. ফান্ডার আপনার 'মীযানুল হক্ক' গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, ঈশ্বরের বিধান কখনো রহিত হতে পারে না। এখন প্রমাণিত হলো যে, তা রহিত হতে পারে এবং হয়েছে। আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিলের বিধিবিধান রহিত হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত। মি. ফান্ডার ও তাঁর সাথী এ সকল প্রমাণের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হন। মরিয়া হয়ে অবনত মস্তকে তিনি 'রহিতকরণের' সম্ভাবনা স্বীকার করে বলেন, 'আমাদের মতে সম্ভাবনা এক বিষয় আর বাস্তবে রহিত হওয়া অন্য বিষয়।'

[৯] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৩৪-৩৫; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/৮।
[১০] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮২।

www.assunnahtrust.com

এরপর উভয় পক্ষ 'বিকৃতির' বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গী বাইবেলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিকৃতি সাধিত হওয়ার পক্ষে সুনিশ্চিত প্রমাণ পেশ করেন। এক পর্যায়ে মি. ফান্ডার স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, বাইবেলের কিছু বিষয়ে বিকৃতি প্রবেশ করেছে। তাঁরা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, ৭ টি মৌলিক বিষয়ে বাইবেলের মূল পাঠে বিকৃতি ও জালিয়াতি প্রবেশ করেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে ত্রিত্ববাদের মূল প্রমাণ যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭-৮ আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে: "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one". "৭ কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহার তিন একই। ৮ এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।" তাঁরা স্বীকার করেন যে, এ কথাগুলি জাল ও পরবর্তীকালে সংযোজিত।

পাশাপাশি তাঁরা আরো স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে ৪০,০০০ স্থানে 'লিপিকারের ভুল' (erratum) ও পাঠের বিভিন্নতা (Various readings) বিদ্যমান, যে স্থানগুলিতে মূল কথা কি ছিল তা এখন কোনোভাবেই জানা যায় না। তারা আরো বলেন যে, অনেক গবেষকের মতে এরূপ ভুলের সংখ্যা দেড় লাখের বেশি। তবে, তিনি দাবি করেন যে, বাইবেলের কিছু অংশের বিকৃতির কারণে গোটা বাইবেলকে বিকৃত বলা যাবে না বা আংশিক বিকৃতির কারণে বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় না। এ পর্যায়ে উপস্থিত মানুষেরা বিচারকদের মন্তব্য ও রায় জানতে চান। এতে মুফতী রিয়ায উদ্দীন বলেন, কোনো ডকুমেন্টের কিছু অংশ যদি জাল ও বিকৃত বলে প্রমাণিত হয় তবে পুরো ডকুমেন্টটিই আইনের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন উপস্থিত মানুষেরা ইংরেজ বিচারপতি মি. মোসলি স্মিথ (Mosley Smith)-র কাছে তার মতামত জানতে চান। তিনি কোনোরূপ মন্তব্য না করে নীরব থাকেন। এতে উপস্থিত শ্রোতাগণের নিকট সত্য প্রকাশিত হয়ে যায়। আল্লামা রাহমাতুল্লাহর বক্তব্য প্রমাণিত হয় এবং প্রথম দিনের মত বিতর্ক শেষ হয়।

প্রথম দিনের বিতর্কে পাদরি মহোদয়দের পরাজয়ের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ফলে দ্বিতীয় দিনে সহস্রাধিক ব্যক্তি বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় দিনে যখন বিতর্ক পুনরায় শুরু হলো, তখন মি. ফান্ডার ও তাঁর সঙ্গী নতুন কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। বরং তাঁরা বারংবার স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে অগণিত স্থানে লিপিকারের ভুল, পাঠের বিভিন্নতা, শব্দের পরিবর্তন, সংযোজন, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যাখ্যাকে মূল পাঠের মধ্যে সংযোজন ও অন্যান্য পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধিত হয়েছে। আবার তারা দাবি করেন যে, এ সকল পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে যীশুর ঈশ্বরত্ব, ত্রিত্ববাদ, যীশুর রক্তের মাধ্যমে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ববাদ ইত্যাদি বাইবেলের মূল শিক্ষাসমূহ বিকৃত হয় নি। এ পর্যায়ে উপস্থিত একজন মুসলিম পণ্ডিত মি. ফান্ডারকে লক্ষ্য করে বলেন, বড় অবাক বিষয় যে, কোনো পুস্তকে বিকৃতি সাধিত হবে কিন্তু তদ্বারা পুস্তকটির ত্রুটি বা অপূর্ণতা প্রমাণিত হবে না!!

এ পর্যায়ে শাইখ রাহমাতুল্লাহ উঠে বলেন, আমাদের এবং পাদরি ফান্ডার মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য একেবারেই শাব্দিক। আমরা দাবি করেছিলাম যে, বাইবেলের মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত শব্দের, বাক্যের ও আয়াতের কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি করা হয়েছে। মি. ফান্ডার তা স্বীকার করেছেন, তবে তিনি তা 'লিপিকারের ভুল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ পর্যায়ে মি. ফান্ডার ও মি. ফ্রেঞ্চ বলেন যে, এ সকল বিকৃতি বা ভুলের কারণে মূল গ্রন্থের অপূর্ণতা বা দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না। তখন শাইখ রাহমাতুল্লাহ বলেন: আমার ও আমার সঙ্গীর দায়িত্ব এখানেই শেষ। আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি সাধিত হয়েছে এবং কোনো বক্তব্য বাইবেলে আছে বলেই তাকে সন্দেহাতীতভাবে সত্য বা ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করা যায় না; বরং তা বিকৃত বক্তব্য না অবিকৃত বক্তব্য তা পরখ করার দরকার আছে। এখন কোন্ কথাটি বিকৃত নয় তা প্রমাণ করার দায়িত্ব মি. ফান্ডার ও মি. ফ্রেঞ্চের উপরে।

দ্বিতীয় দিনের পরিণতিতে মি. ফান্ডার ভীত হয়ে পড়েন। তিনি বিতর্কের দরজা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও ইতোপূর্বের পত্রালাপে তারা ৫টি বিষয়ে বিতর্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিতর্কের সকল পূর্বশর্ত নির্ধারিত করে নেন, তবুও তিনি পরবর্তী বিতর্কের জন্য নতুন একটি শর্তারোপ করেন। তিনি শাইখ রাহমাতুল্লাহর কাছে দাবি করেন যে, পরবর্তী বিতর্কে উপস্থিত হওয়ার শর্ত এই যে, বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে মূল বক্তব্য বিকৃতিমুক্ত বলে তাকে স্বীকার করতে হবে। বিশেষত, যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ বিষয়ক বাইবেলের সকল বক্তব্য সঠিক ও বিকৃতিমুক্ত বলে মেনে না নিলে তিনি বিতর্ক করবেন না বলে জানান। তিনি বলেন যে, এ সকল বিষয়ে কোনো যুক্তি, বিবেক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কথা বলা চলবে না, বরং বাইবেলের সকল বক্তব্য আক্ষরিকভাবে সত্য বলে মেনে নিয়ে বিতর্ক করতে হবে; কারণ যুক্তি, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে এ বিষয় প্রমাণ করা যায় না।

শাইখ রাহমাতুল্লাহ বলেন, আমরা তো প্রমাণ করেছি যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছে। আপনারা নিজেরাও ৭/৮ স্থানে মূল পাঠ বিকৃত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এছাড়া ৪০ হাজার স্থানে লিপিকারের ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। যাকে আপনি লিপিকারের ভুল বলছেন আমরা তাকেই বিকৃতি বলছি। কাজেই মূল বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এরপরও কিভাবে মেনে নেব যে, বাইবেলের মূল বক্তব্য বিকৃতিমুক্ত বা অবিকৃত?

এ উদ্ভট নতুন শর্ত পেশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে বিতর্ক করে সকলের সামনে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা। শাইখ রাহমাতুল্লাহ এ উদ্ভট শর্তের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। এজন্য তিনি দ্বিতীয় দিনের বিতর্কের শেষে বলেন, তিনি

www.assunnahtrust.com

আগামী দুই মাস পর্যন্ত একাধারে মি. ফান্ডারের সাথে বিতর্কে উপস্থিত হতে প্রস্তুত রয়েছেন। এমতাবস্থায় মি. ফান্ডার ও তাঁর সঙ্গীর আর কিছুই বলার থাকে না। তাঁরা পরিপূর্ণ নীরব থাকতে বাধ্য হন।[১১]

বিতর্কের ধারা-বিবরণী তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাইয়িদ আব্দুল্লাহ আকবারআবাদী ছিলেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রীয় অনুবাদক। তিনি দুদিনই উপস্থিত থেকে বিতর্কের হুবহু ধারা-বিবরণী উর্দুতে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দুভাগে বিতর্কের বিবরণী প্রকাশ করেন। প্রথম ভাগে শাইখ রাহমাতুল্লাহ ও পাদরিদের মধ্যে বিতর্কের আগে ও পরে যে সব পত্রের আদান প্রদান হয়, সেগুলি তিনি সংকলন করেন ফার্সী ভাষায়। দ্বিতীয় অংশে তিনি দুদিনের বিতর্কের ধারাবিবরণী উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম ভাগের নাম দেন 'আল-মুরাসালাতুদ দীনীয়্যা' বা 'ধর্মীয় পত্রালাপ' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দেন 'আল-মুবাহাসাতুদ দীনীয়্যা' বা 'ধর্মীয় বিতর্ক'। এ দ্বিতীয় অংশকে আবার তিনি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। বিতর্কের কিছুদিন পরেই, ১২৭০ হিজরিতে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) তার এই পুস্তক দুটি আগ্রায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এছাড়া অন্য একজন আলিম শাইখ উযিরুদ্দীন ইবনু শারাফুদ্দীনও উক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিতর্কের দুদিনের ধারা-বিবরণী ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। তিনিও বিতর্কের বিবরণের সাথে বিতর্কের আগে ও পরে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হয় সেগুলি সংকলন করেন। তিনি তার পুস্তকটির নামকরণ করেন: "আল-বাহসুশ শারীফ ফী ইসিবাতিন নাসখি ওয়াত তাহরীফ" (রহিতকরণ ও বিকৃতির প্রমাণে মর্যাদাময় গবেষণা)। দিল্লীর তৎকালীন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র ও যুবরাজ মির্যা ফাখরুদ্দীন ইবনু সিরাজুদ্দীন বাহাদুর শাহ এই পুস্তকটি মুদ্রণ ও প্রচারের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে হাফিয আব্দুল্লাহ দিল্লীর 'ফাখরুল মাতাবি' নামক প্রেস থেকে পুস্তকটি মুদ্রণ করেন ১২৭০ হিজরিতে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে)।

মি. ফান্ডার সহস্রাধিক মানুষের সামনে তার প্রকাশ্য পরাজয় ঢাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে এই দু দিনের বিতর্ক অনুষ্ঠানের একটি ধারা-বিবরণী তৈরি করেন। এতে তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন করেন এবং এই বিকৃত বিবরণীটি ১৮৫৫ সালে প্রকাশ করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত সে সকল স্থানের মানুষেরা বিতর্কে উপস্থিত ছিল না তাদের মধ্যে বিতরণ করেন। এজন্য সাইয়িদ আব্দুল্লাহ আকবার আবাদী তার পুস্তকের সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর সংযোজন করে দেন। অনুরূপভাবে, শাইখ উযীরুদ্দীন ইবনু ফাখরুদ্দীনও তার রচিত পুস্তক 'আল-বাহসুশ শারীফ"-এর সাথে ফান্ডারের বিকৃতির উপরে পর্যালোচনা সংযোজন করেন এবং সাথে সাথে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করেন।[১২]

৫. ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ও শাইখ রাহমাতুল্লাহর হিজরত

বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামের ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। বস্তুত, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান যাজকদের ও চার্চের মূল বৈশিষ্ট্য। যেদিন থেকে রোমান সম্রাট কন্সটান্টাইন (৩১২-৩৩৭খৃ) খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন, সেদিন থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বৎসরের খৃস্টধর্মীয় ইতিহাস মূলত ধর্মীয় সহিংসতার রক্তরঞ্জিত ইতিহাস। খৃস্টান পাদরিগণ এবং খৃস্টান চার্চ সর্বদা অন্যধর্ম ও ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানদের প্রতি 'শূন্য সহিষ্ণুতা' (Zero tolerance) প্রদর্শন করেছেন। এমনকি ইউরোপে 'সেকুলারিজম' প্রতিষ্ঠার পরেও ইউরোপীয়রা যেখানেই উপনিবেশ গড়েছেন সেখানেই বিভিন্ন অজুহাতে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তারা 'গসপেল প্রচারের' নামে ভিন্ন ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার করেছেন এবং সকল ভিন্নধর্ম ও ভিন্নমতকে "heresy" বা ধর্ম-বিরোধিতা নাম দিয়ে নির্মূল করতে চেষ্টা করেছেন।[১৩]

ভারতের বৃটিশ উপনিবেশের ইতিহাসও একই সূত্রে বাঁধা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অর্ধশতাব্দীর অধিক সময় খৃস্টান শাসক ও প্রচারকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং জোরপূর্বক বা কৌশলে ধর্মান্তর করার চেষ্টা করেন। আর এ ছিল ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহি বিদ্রোহ) মূল কারণ।[১৪] স্বভাবতই আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী এ যুদ্ধের অগ্রনায়কদের অন্যতম ছিলেন। বর্বর হিংস্রতার মাধ্যমে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা যুদ্ধ দমন করতে সক্ষম হন। বিদ্রোহীদের দমনের পরে বিদ্রোহের শাস্তি হিসেবে অগণিত আলিম ও নিরপরাধ মুসলিমকে বিচারের নামে তারা নির্বিচারে হত্যা করেন। এছাড়া আরো অনেককে কারারুদ্ধ বা আন্দামানে নির্বাসিত করেন। তারা শাইখ রাহমাতুল্লাহকে শাস্তি প্রদানের জন্য অতি-উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তারা তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য এক হাজার রুপিয়া পুরস্কার ঘোষণা করে। তৎকালীন সময়ে তা ছিল অনেক বড় অংক। এছাড়া তারা তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ১৪২০ রুপিয়ায় নিলামে বিক্রয় করে। সর্বোপরি, তারা তাঁর রচিত সকল পুস্তক প্রচার, মুদ্রণ, সংগ্রহ ও পাঠ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে।[১৫]

সর্বশেষ এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, রাহমাতুল্লাহর বিরুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আক্রোশ মূলত ছিল ধর্মীয়। রাহমাতুল্লাহ স্বাধীনতা-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখেন নি। তাঁর লেখালেখি ছিল মূলত খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের

[১১] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৩৪-৩৬; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
[১২] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৩৫-৩৬।
[১৩] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, Religions and their Representation, Dhaka, The Independent, 22/11/2006, p 7.
[১৪] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
[১৫] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/২১; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

www.assunnahtrust.com

বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্রোহের অযুহাতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খৃস্টান পাদরীদের মিথ্যাচার ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ।

শাইখ রাহমাতুল্লাহ আত্মগোপন করেন এবং ইয়ামানের পথে মক্কায় হিজরত করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরের বৎসর ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে (১২৭৪ হিজরি) তিনি মক্কায় পৌঁছান। কিছু দিনের মধ্যেই মক্কার অন্যতম আলিম মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আহমদ যীনী দাহলান, মক্কার শাসক শরীফ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আউন ও অন্যান্য আলিম ও গণ্যমান্য ব্যক্তি শাইখ রাহমাতুল্লাহর পরিচয় জেনে ফেলেন। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং মসজিদে হারামে শিক্ষাদানের অনুমতি প্রদান করেন।[১৬]

৬. ইস্তাম্বুল সফর ও 'ইযহারুল হক্ক' রচনা

পাদরি ড. ফান্ডার খৃস্টধর্ম ও ইসলাম-ধর্ম সম্পর্কে নিজের জ্ঞান এবং তাঁর রচিত মীযানুল হক্ক ও অন্যান্য পুস্তকের বিষয়ে অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন। তার বড়-বড় বুলি ভারতের ইংরেজ শাসক ও খৃস্টীয় প্রচারকদের মোহাবিষ্ট করেছিল। তারা ভেবেছিলেন যে, সত্যই মি. ফান্ডারের কোনো জবাব নেই এবং তার সামনে দাঁড়ানোর মত কোনো মুসলিম আলেম নেই। এজন্য তার বিষয়ে তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা ছিল এবং তার সুনিশ্চিত বিজয় প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রবল উদ্দীপনার সাথে তারা বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বিতর্কে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সামনে পরাজয় ও প্রকাশ্য মঞ্চে বাইবেলের মধ্যে কিছু বিকৃতি ও জালিয়াতি আছে বলে স্বীকার করার ফলে তার প্রতি তাদের মোহ ভঙ্গ হয়। যদিও তিনি এ সকল জালিয়াতি ও বিকৃতির কারণে বাইবেলের মূল বক্তব্য বিকৃত হয় নি বলে দাবি করেন, তবে তা উপস্থিত খৃস্টানদেরকে তৃপ্ত করতে পারে না। ভারতের খৃস্টান সমাজে মি. ফান্ডার অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। তখন তিনি ইউরোপে ফিরে যান। জার্মান, সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে কিছু সময় কাটানোর পর চার্চ তাকে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য তৎকালীন ইসলামী খিলাফাতের প্রাণকেন্দ্র তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করে। ১৮৫৮ সালে তিনি তুরস্কে গমন করেন।[১৭]

'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' মিথ্যা বলা প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহমাতি সাধু পৌলের শিক্ষা ও নীতি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলতেন। তিনি বলেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[১৮]। এ নীতির ভিত্তিতেই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য' বা 'ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য' বাইবেল বিকৃত করাকে ভাল কাজ বলে গণ্য করতেন পূর্ববর্তী খৃস্টান পণ্ডিতগণ। ইযহারুল হক্ক গ্রন্থের মধ্যে খৃস্টান পণ্ডিতদের এরূপ জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের অগণিত উদাহরণ পাঠক দেখবেন।

পাদরি ড. ফান্ডারও একই ধারা অনুসরণ করেন। 'ঈশ্বরের গৌরবার্থে' ও 'ঈশ্বরের বাণী মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য' তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তুরস্কে মুসলিমদের মধ্যে প্রচার করেন যে, তিনি প্রকাশ্য বিতর্কে রাহমাতুল্লাহ ও অন্যান্য ভারতীয় আলিমকে পরাজিত করেন। ফলে ভারতের মুসলিমগণ দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তথাকার মসজিদগুলি গীর্জায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই তুরস্কের মুসলিমদেরও উচিত ভারতীয় মুসলিমদের অনুসরণে দলে দলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা। নানান রঙ মিশিয়ে এ সকল কথা তিনি তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করতে থাকেন।[১৯]

এ সকল প্রচারে তুরস্কের সাধারণ মুসলিম, এমনকি স্বয়ং খলীফা 'আব্দুল 'আযীয খান (রাজত্ব : ১২৭৭-১২৯৩হি/ ১৮৬০-১৮৭৬খৃ) বিচলিত হন। তিনি এ বিষয়ে ভারতীয় হাজীদের নিকট থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মক্কার প্রশাসককে নির্দেশ দেন। বিশেষত মি. ফান্ডারের সাথে শাইখ রাহমাতুল্লাহর বিতর্ক সম্পর্কে সঠিক তথ্য তিনি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মক্কার প্রশাসক তাকে জানান যে, শাইখ রাহমাতুল্লাহ স্বয়ং মক্কায় অবস্থান করছেন। তখন খলীফা তাঁকে বিশেষ রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে (১২৮০ হিজরির রজব মাসে) শাইখ রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌঁছান। তাঁর তুরস্কে আগমনের কিছুদিনের মধ্যে ড. ফান্ডার সবার অগোচরে তুরস্ক ছেড়ে পালিয়ে যান। দু বছর পরে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি লন্ডনে মৃত্যু বরণ করেন।[২০]

কোনো কোনো খৃস্টান পাদরি ড. ফান্ডারের পলায়নের এ লজ্জাজনক ইতিহাস মিথ্যা দিয়ে আবৃত করতে চেষ্টা করেন। 'লিওয়াউস সালীব' বা ক্রুশের পতাকা' গ্রন্থের লেখক জনৈক আরবীয় পাদরি মি. বারাকাহ উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান আব্দুল আযীয খান মি. ফান্ডারকে তুরস্কে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে বিতর্কে বসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু শাইখ রাহমাতুল্লাহ তুরস্কে পৌঁছানোর পূর্বেই মি. ফান্ডার মৃত্যুবরণ করেন।

উপরের তথ্যাদি থেকেই এই দাবির মিথ্যাচার স্পষ্ট হয়েছে। বস্তুত শাইখ রাহমাতুল্লাহর তুরস্কে পৌঁছানোর দু বৎসর পরে পরাজিত-ভঙ্গহৃদয় মি. ফান্ডার মৃত্যুবরণ করেন। বাস্তব ঘটনাবলির আলোকে প্রমাণিত যে শাইখ রাহমাতুল্লাহর তুরস্কে পৌঁছানোর

[১৬] আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১১-১২; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত ১/২১।
[১৭] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৩; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
[১৮] রোমান ৩/৭।
[১৯] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৩; ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
[২০] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৩-৪৪।

www.assunnahtrust.com

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মি. ফান্ডার তুরস্ক ত্যাগ করেন। বস্তুত বিতর্কে অংশ নিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যই তিনি পালিয়ে যান।[২১]

তুরস্কের সুলতান 'আব্দুল 'আযীয খান শাইখ রাহমাতুল্লাহকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও উলামায়ে কেরামের সামনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের বর্বরতা, খৃস্টানগণের অপপ্রচারের অবস্থা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম উলামায়ে কেরামের ভূমিকা ও বিশেষকরে মি. ফান্ডারের সাথে তাঁর বিতর্কের ঘটনা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। সকল ঘটনা শ্রবণ করার পরে সুলতান খৃস্টান মিশনারিদের প্রতি বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন। তিনি তুরস্কে তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেন।

পক্ষান্তরে শাইখ রাহমাতুল্লাহর প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রায় প্রতিদিন সালাতুল ইশার পরে প্রধানমন্ত্রী খাইরুদ্দীন পাশা তুনূসী, প্রধান মুফতি শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ আহমদ আস'আদ মাদানী ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেন। ইসলাম প্রচারে ও ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার রোধে শাইখ রাহমাতুল্লাহর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ সুলতান তাকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় খেতাব 'বিসাম মাজীদী' ও পদক প্রদান করেন এবং তাঁর জন্য পাঁচশত তুর্কি স্বর্ণমুদ্রা মাসিক ভাতা নির্ধারণ করেন। সর্বোপারি তিনি তাকে মক্কার রাষ্ট্রীয় পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করেন।[২২]

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত খৃস্টধর্মের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে শাইখ রাহমাতুল্লাহর অতুলনীয় জ্ঞানের কথা অনুভব করে সুলতান 'আব্দুল 'আযীয খান ও প্রধানমন্ত্রী খাইরুদ্দীন পাশা তাকে এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য ও মৌলিক পুস্তক রচনার জন্য অনুরোধ করেন। পুস্তকটি রচনার জন্য যতদিন প্রয়োজন ততদিন তাঁরা তাকে রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তুরস্কে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতোপূর্বে মক্কার অন্যতম আলিম মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আহমদ যীনী দাহলান তঁকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতে শাইখ রাহমাতুল্লাহ গ্রন্থটি রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১২৮০ হিজরির রজব মাসের ১৬ তারিখে (২৬/১২/১৮৬৩) তিনি পুস্তকটি রচনা শুরু করেন। ১২৮০ হিজরির যুলহাজ্জ মাসের শেষে (১৮৬৪ সালের জুন মাসের শুরুতে)- মাত্র ৬ মাসের মধ্যে তিনি এই মহামূল্যবান পুস্তকটি রচনা শেষ করেন।[২৩]

পুস্তকটির রচনা সমাপ্ত করে তিনি হস্তলিখিত আরবী পাণ্ডুলিপিটি প্রধানমন্ত্রী খাইরুদ্দীন পাশাকে প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ভূমিকা পাঠ করে দেখেন যে, তিনি ভূমিকায় পুস্তকটি রচনার জন্য অনুরোধকারী হিসেবে মাসজিদুল হারামের ইমাম আল্লামা সাইয়িদ আহমদ বিন যীনী দাহ্লান-এর নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তুরস্কের সুলতান বা প্রধানমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয় নি। এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে তিনি আল্লামা রাহমাতুল্লাহকে বলেন, আমি ও খলীফাই তো আপনাকে অনুরোধ করলাম, কিন্তু আপনি আমাদের নাম লিখলেন না কেন? প্রশংসা বা লোক দেখানোর জন্য নয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রকাশের জন্য এবং খলীফার অবদান স্বীকার করার জন্য তো অন্তত তাঁর নাম লেখা দরকার ছিল। উত্তরে শাইখ রাহমাতুল্লাহ বলেন, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়। এ বিষয়ক কর্ম অবশ্যই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মহান উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। এর মধ্যে খলীফা, শাসক বা মন্ত্রীদের নাম, প্রশংসা ইত্যাদি উল্লেখ না করাই উত্তম। এছাড়া 'আল্লামা দাহলানই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে লিখতে আমাকে উৎসাহ দেন। কাজেই তাঁর নামই উল্লেখ করেছি। তাঁর এ দৃঢ়তায় প্রধানমন্ত্রী ও সুলতান অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়।[২৪]

সুলতানের নির্দেশে পুস্তকটির দ্রুত মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সুলতানের উদ্যোগে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি ও তুর্কি ভাষাসহ নয়টি ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করার নির্দেশ দেন।[২৫]

আল্লামা রাহমাতুল্লাহর প্রতি তুর্কী সুলতান 'আব্দুল 'আযীয খান (রাজত্ব : ১২৭৭-১২৯৩হি/ ১৮৬০-১৮৭৬খৃ) ও পরবর্তী সুলতান ২য় 'আব্দুল হামীদ খানের (রাজত্ব : ১২৯৩-১৩২৮হি/ ১৮৭৬-১৯১০খৃ)[২৬] ভক্তি ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম। তাঁরা তাঁকে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ইস্তাম্বুলে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু শাইখ রাহমাতুল্লাহর কাছে খিলাফতের রাজধানীর রাষ্ট্রীয় মর্যাদার চেয়ে মক্কার পবিত্রভূমিতে ইসলামী শিক্ষা ও 'ইলমের খিদমত ছিল অধিক প্রিয়। তিনি ইস্তাম্বুলে অবস্থানে অপারগতা জানিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। প্রথমবার ১৮৬৩-১৮৬৪ সালের এ সফরের পরে পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তুরস্কে গমন করেন। পরবর্তী খলীফা ২য় আব্দুল হামীদও (১৮৭৬-১৯১০ খৃ) তাঁকে বিভিন্ন পদক, উপহার ও সম্মাননা প্রদান করেন। তিনি তাঁকে 'ইমাদুল হারামাইন আশ-শারীফাইন' (দুই পবিত্র হারামের স্তম্ভ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নির্ভেজাল স্বর্ণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রশংসা-বাক্য খচিত একটি তরবারী তাকে উপহার দেন।[২৭]

---

[২১] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৪।
[২২] আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১২-১৪।
[২৩] রাহমাতুল্লাহ কীরানবী, ইযহারুল হক্ক (বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, তা. বি.) ১/২৪, ২/৫৯৬-৫৯৭।
[২৪] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৪৫।
[২৫] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত ১/৫২, ৭২-৭৩।
[২৬] মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬) ৮/১৮২-২১১।
[২৭] আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১৭-১৮।

www.assunnahtrust.com

৭. আরব-উপদ্বীপে সর্বপ্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এ সময়ে ভারতের মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার তুলনায় আরব উপদ্বীপের শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুন্নত ছিল। আরবের শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল মূলত মসজিদ-নির্ভর। মসজিদে কিছু পুস্তক পাঠদান ছাড়া সমগ্র আরব-উপদ্বীপে কোনো নিয়মতান্ত্রিক 'বিদ্যালয়' বা মাদ্রাসা ছিল না। মসজিদ ভিত্তিক এ সকল পাঠচক্রের জন্যও কোনো নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী ছিল না। আলিমগণ আগ্রহী ছাত্রদের নিয়ে কিছু গ্রন্থ পাঠ করতেন। পবিত্রভূমি মক্কার শিক্ষা-ব্যবস্থার এ দুর্বলতা শাইখ রাহমাতুল্লাহকে ব্যাথিত ও চিন্তিত করে। তিনি এ অপূর্ণতা দূর করতে সচেষ্ট হন। সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে ১২৮৫ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে) তিনি মক্কায় একজন ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসাটি তখন 'আল-মাদ্রাসা আল-হিনদিয়্যা' অর্থাৎ 'ভারতীয় মাদ্রাসা' এবং 'মাদরাসাতুশ শাইখ রাহমাতুল্লাহ' বা 'শাইখ রাহমাতুল্লাহর মাদ্রাসা' নামে পরিচিত ছিল। স্থানের সংকীর্ণতার কারণে শাইখ রাহমাতুল্লাহ মাদ্রাসাটিকে যথাযথ রূপ দিতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় ১২৮৯ হিজরি সালে (১৮৭৩ খৃস্টাব্দ) 'সাওলাতুন নেসা বেগম' নামক একজন ধনাঢ্য বাঙালী মহিলা হজ্জ করতে মক্কায় আগমন করেন। তখন মক্কায় অবস্থানরত ভারতীয় 'আলিমদের মধ্যে রাহমাতুল্লাহই ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। উক্ত মহিলা মক্কায় একটি মুসাফিরখানা বা দরিদ্র হাজীদের জন্য 'রিবাত' প্রতিষ্ঠার জন্য রাহমাতুল্লাহর সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। রাহমাতুল্লাহ তাঁকে মুসাফিরখানার পরিবর্তে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। উক্ত মহিলা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাহমাতুল্লাহকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করেন। সাওলাতুন্নেসার অনুদানের দ্বারা রাহমাতুল্লাহ প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে তাঁর মাদ্রাসাটি তথায় স্থানান্তরিত করেন। ১২৯০ হিজরির ১৫ই শাবান বুধবার (৮/১০/১৮৭৩) নতুন ভবনে মাদ্রাসাটির উদ্বোধন হয়। অনুদানকারীর নাম অনুসারে শাইখ রাহমাতুল্লাহ মাদ্রাসাটির নামকরণ করেন 'আল-মাদরাসাতুস সাওলাতিয়্যাহ' তথা 'সাওলাতিয়্যাহ মাদ্রাসাহ'। মৃত্যু পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় দু দশক শাইখ রাহমাতুল্লাহ মাদ্রাসাটির পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[২৮]

শাইখ রাহমাতুল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসাটি ছিল মক্কার প্রথম মাদ্রাসা। শুধু মক্কা বা হিজাজেই নয়, উপরন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে বা বর্তমান সৌদি আরবের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম নিয়মতান্ত্রিক বিদ্যালয়। আরব উপদ্বীপের শিক্ষা ও সভ্যতার ইতিহাসে এবং বিশেষ করে মক্কা ও হিজাজের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে এ মাদ্রাসাটির অবদান অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এই মাদ্রাসাটিই ছিল হিজাজ ও গোটা সৌদি আরবের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

৮. জীবনাবসান

ভারতের ইংরেজ শাসকগণ এবং খৃস্টান প্রচারকগণ চেয়েছিলেন রাহমাতুল্লাহর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। সাময়িক সামরিক বিজয় তারা লাভ করেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন এ বিজয়ের মাধ্যমেই তারা রাহমাতুল্লাহকে থামিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। জিহ্বা, কলম ও তরবারীর এ মহান মুজাহিদকে আল্লাহ হেফাযত করলেন, তাঁকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করলেন এবং কর্মময় দীর্ঘ জীবন দান করলেন। শিক্ষা বিস্তার, ইসলাম প্রচার, খৃস্টান পাদরিদের অপ-প্রচারের প্রতিরোধ ও সামগ্রিকভাবে ইসলামের খেদমতে বিভিন্নমুখী অবিস্মরণীয় অবদান রাখার পরে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে ১৩০৮ হিজরির রামাদান মাসের ২২ তারিখ শুক্রবার (১/৫/১৮৯১ খৃ) তিনি পবিত্র মক্কায় ইন্তেকাল করেন এবং মক্কার 'মুয়াল্লা' গোরস্থানে উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর কবরের নিকটে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৯]

৯. রচনাবলী

'আল্লামা রাহমাতুল্লাহ খৃস্টান পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ওয়ায-মাহফিল ও গণ-সংযোগের জন্য ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করতেন। এছাড়া প্রচারকদের প্রশিক্ষণেও তিনি কর্মরত ছিলেন। এ সকল কর্মের পাশাপাশি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে কিছু পুস্তক ছিল ইসলামী আকীদা, ফিকহ ইত্যাদি কেন্দ্রিক। যেমন, শিয়াদের আকীদা বা ধর্মবিশ্বাসের বিভ্রান্তি অপনোদনে প্রসিদ্ধ ভারতীয় আলিম শাহ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (১৭৪৬-১৮২৪খৃ/ ১১৫৯-১২৩৯হি) রচিত 'আত-তুহফাতুল ইসনা আশারীয়া' নামক ফার্সী গ্রন্থটি তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন এবং সালাতের মধ্যে হাত উঠানো বা রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এছাড়া তিনি তুরস্কে অবস্থানকালে 'ইযহারুল হক্ক' পুস্তক রচনার পরে 'আত-তাম্বীহাত ফী ইসবাতিল ইহতিয়াজ ইলাল বি'সাতি ওয়াল হাশর' (পুনরুত্থান ও পরকালের প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার প্রমাণ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি তুর্কি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নাস্তিক ও পরকাল অস্বীকারকারীদের বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ও পরকালের বিশ্বাসের যৌক্তিক দিক আলোচনা করেন।

'আল্লামা রাহমাতুল্লাহর অবশিষ্ট রচনাবলী মূলত খৃস্টান প্রচারকদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বা তাদের রচিত বিভিন্ন পুস্তকের বিভ্রান্তি অপনোদনে রচিত। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

(১) ইযালাতুল আওহাম (বিভ্রান্তি অপনোদন)। খৃস্টান পাদরিদের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার খণ্ডন করতে শাইখ রাহমাতুল্লাহ ফার্সী ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। ১২৬৯ হিজরি সালে (১৮৫৩ খৃস্টাব্দে) দিল্লীতে পুস্তকটি মুদ্রিত হয়। মুদ্রিত পুস্ত

[২৮] আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১৫-১৬: ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/২১।
[২৯] ড. মোহর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/২১; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/২২-২৩

www.assunnahtrust.com

কটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৬৪। শাইখ নূর মুহাম্মাদ উর্দু ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তিনি উর্দু অনুবাদটির নামকরণ করেন 'দাফিউল আসকাম' (অসুস্থতার প্রতিকার)।

(২) ইযালাতুশ শুকূক (সন্দেহ অপনোদন)। খৃস্টান পাদরিগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে উর্দু ভাষায় তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, খৃস্টান পাদরিগণ ব্যাপক প্রচারণা, মিথ্যাচার, লোভ বা ভয়-প্রদর্শন ও জবরদস্তির মাধ্যমে উনবিংশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে কয়েকজন সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে খৃস্টান বানাতে সক্ষম হন। তারা এদের নামের আগে মৌলভী, মুনসী ইত্যাদি 'উপাধি' লাগিয়ে এদের নামে বিভিন্ন বই-পুস্তক রচনা করে প্রচার করতেন। করাচী শহরের এরূপ একজন ধর্মান্তরিতের নামে পাদরিগণ 'সুআলাতু কারানজী' বা কারানজীর প্রশ্নাবলী নামে ইসলাম ধর্ম ও মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর ২৯টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বিষয়টি জানতে পেরে দিল্লীর মোগল সম্রাটের পুত্র ও যুবরাজ মির্যা ফাখরুদ্দীন বাহাদুর পুস্তকটি শাইখ রাহমাতুল্লাহর নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২৬৮ হিজরি সালে (১৮৫২ খৃস্টাব্দে) প্রশ্নগুলির উত্তরে তিনি দুই খণ্ডে ১১১৬ পৃষ্ঠার এ বিশাল পুস্তক রচনা করেন। অগণিত অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে তিনি এই পুস্তকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুয়তের সত্যতা এবং বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করেন। শাইখ রাহমাতুল্লাহর ছাত্র ও মাদ্রাজের 'আল-বাকিয়াতুস সালিহাত' মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আব্দুল ওয়াহ্হাব বেল্লোরী নিজ খরচে পুস্তকটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন।

(৩) আল-ই'জাযুল ঈসাবী (ঈসার (আ) অলৌকিক কর্ম)। আগ্রায় ১২৭০ হিজরিতে (১৮৫৩-১৮৫৪) তিনি উর্দু ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন এবং ১২৭১ হিজরি সালে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়। ৭৭৩ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ পুস্তকে তিনি অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে, প্রচলিত বাইবেল বিকৃত ও পরিবর্তিত এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়তের দ্বারা বাইবেলের অনেক বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

(৪) আহসানুল আহাদীস ফী ইবতালিত তাসলীস (ত্রিত্ববাদ খণ্ডনে সর্বোত্তম বক্তব্য)। ১২৭১ হি (১৮৫৪ খৃ) তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। এবং পরবর্তীতে তা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি জ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি ও বাইবেলের বিভিন্ন উক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন।

(৫) আল-বুরূকুল লামি'য়া (উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা)। তিনি আরবী ভাষায় পুস্তকটি রচনা করেন। এ পুস্তকে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আবির্ভাব বিষয়ে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের বহুসংখ্যক উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বাইবেলের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুসারেই তিনি শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। পুস্তকটি মুদ্রিত হয় নি। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ইংরেজগণ শাইখ রাহমাতুল্লাহর সম্পত্তি লুট করে, নিলামে বিক্রয় করে এবং তার লিখিত বই-পুস্তক পাঠ, প্রকাশ বা ঘরে রাখা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। এ সময়ে তার লিখিত অমুদ্রিত কয়েকটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি নষ্ট বা লুণ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিও ছিল।

(৬) মু'আদ্দিলু ই'ওয়িজাজিল মীযান (মাপযন্ত্রের বক্রতা সংশোধনকারী)। উর্দু ভাষায় তিনি পুস্তকটি রচনা করেন। ড. ফান্ডার রচিত 'মীযানুল হক্ক' (Scale of Truth) বা 'সত্যের মাপদণ্ড' গ্রন্থটির কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত পাদরিদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক পুস্তক। ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতিতে পুস্তকটি পরিপূর্ণ। ১৮৩৩ সালে বইটির প্রথম ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৩৫ সালে তিনি তার ফার্সী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে তার উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ভারতের পাদরিগণ মুসলিমদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের জন্য এ পুস্তকটির উপরেই মূলত নির্ভর করতে থাকেন। ভারতের কতিপয় মুসলিম আলিম এ পুস্তকের মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতির বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে ছিল শাইখ আবূ মানসূর দেহলবী লিখিত 'মীযানুল মীযান' (মাপদণ্ডের মাপদণ্ড), শাইখ মুহাম্মাদ আল হাসান রচিত 'আল-ইসতিফসার' (ব্যাখ্যা অনুসন্ধান) ও শাইখ রাহমাতুল্লাহ লিখিত ইযালাতুল আওহাম (বিভ্রান্তি অপনোদন)। এ সকল গ্রন্থের সমালোচনার কারণে মি. ফান্ডার সতর্ক হন। তিনি তার পুস্তকের কিছু তথ্য পরিবর্তন করেন এবং বিশেষ করে তথ্যাদির পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৯ সালে আগ্রায় ফার্সী ভাষায় পুস্তকটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তী বৎসর ১৮৫০ সালে বইটির উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করেন। মি. ফান্ডারের পুনর্বিন্যাসের ফলে বইটির বিষয়বস্তু ও মিথ্যাচারের বিশেষ পরিবর্তন না হলেও ভাষা ও বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফলে ইসতিফসার বা ইযালাতুল আওহাম গ্রন্থ পাঠ করে 'মীযানুল হক্ক' গ্রন্থের সাথে মিলাতে গেলে পাঠক পৃষ্ঠা, খণ্ড ও বাক্যের মিল খুঁজে পাবেন না। এতে পাঠকের কাছে মনে হবে যে, আল হাসান বা রাহমাতুল্লাহ মি. ফান্ডারের পুস্তক না পড়ে আন্দাযে তার বিরুদ্ধে লিখেছেন। এজন্য শাইখ রহমাতুল্লাহ এ নতুন সংস্করণের বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচার প্রকাশের জন্য 'মু'আদ্দিল ই'ওয়িজাজিল মীযান বা মাপযন্ত্রের বক্রতা সংশোধনকারী নামক এই পুস্তকটি রচনা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে শাইখ রাহমাতুল্লাহ পুস্তকটি মুদ্রণ করতে পারেন নি। এ সময়ে পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়।

(৭) তাক্বলীবুল মাতা'ইন (অভিযোগের প্রত্যুত্তর)। মি. স্মিথ নামক জনৈক পাদরি 'তাহকীকুদ দীনিল হাক্ক' (সত্য ধর্ম অনুসন্ধান) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮৪২ সালে ভারতে তিনি পুস্তকটি প্রকাশ করেন। শাইখ মুহাম্মাদ আল হাসান পুস্তকটির প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ফলে পাদরি মি. স্মিথ তার বইয়ের বিষয়বস্তু কিছু পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করেন এবং ১৮৪৬ সালে পুস্তকটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। শাইখ রাহমাতুল্লাহ 'তাক্বলীবুল মাতাইন' নামক এই পুস্তকে উক্ত পুস্তকের নতুন সংস্করণের অভিযোগাদি খণ্ডন করেন ও ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেন। এই গ্রন্থটিও অমুদ্রিত অবস্থায় হারিয়ে যায়।

www.assunnahtrust.com

(৮) 'মি'ইয়ারুত তাহক্কীক' (সত্যানুসন্ধানের মানদণ্ড)। পাদরি সাফদার আলী 'তাহক্কীকুল ঈমান' (বিশ্বাসের অনুসন্ধান) নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকটির প্রতিবাদে শাইখ রাহমাতুল্লাহ এই পুস্তকটি রচনা করেন। এই পুস্তকটিও অমুদ্রিত অবস্থায় হারিয়ে যায়। উপরের ৮টি পুস্তকই শাইখ রাহমাতুল্লাহ ভারতে থাকা অবস্থায় রচনা করেন।[৩০]

(৯) ইযহারুল হক্ক (সত্যের প্রকাশ)। আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, গ্রন্থকার ইস্তাম্বুলে বসে ১৮৬৪ সালে পুস্তকটি রচনা করেন। খৃস্টধর্মের আলোচনায় ও ইসলামের বিরুদ্ধে পাদরিদের বিভ্রান্তি অপনোদনে গ্রন্থটি অতুলনীয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই অনেক মুসলিম মনীষী তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ও বিশেষত খৃস্টধর্মের আলোচনায় বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী নওমুসলিম অনেক ইহূদী-খৃস্টান যাজক ও পণ্ডিত এ বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। তবে, বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, আলোচনার গভীরতা, তথ্যের বিশুদ্ধতা, তথ্যসূত্রের নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিক উপস্থাপনায় ইযহারুল হক্ক অসাধারণ ও অতুলনীয়। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি গ্রন্থকার খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থ, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা তাকে এই অসাধারণ গ্রন্থ রচনায় সক্ষম করেছে।

গ্রন্থটি শুধু মুসলিম জনসাধারণ ও আলিমগণকেই সাহায্য করে নি, উপরন্তু অনেক আলোক-প্রাপ্ত নও মুসলিমও এই পুস্তকটি থেকে উপকৃত হয়েছেন। তঁদের মধ্যে রয়েছেন খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী প্রসিদ্ধ আরবীয় রাজপুত্র, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক নেতা আহমদ ফারিস শিদইয়াক (১৮৮৭খৃ /১৩০৪ হি) এবং খৃস্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারী এই শতকের প্রসিদ্ধ মিশরীয় পাদরি, প্রচারক, খৃস্টধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক ইবরাহীম খলীল আহমদ। একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পাঠককে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে।

গ্রন্থকার তার আলোচ্য বিষয়কে একটি ভূমিকা ও ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন।

(ক) ভূমিকা: প্রায় অর্ধশতপৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কিছু মূলনীতি আলোচনা করেছেন, যেগুলি বইয়ের আলোচনা অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। এ সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে (১) ধর্মীয় বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদের কতিপয় মূলনীতি ও শিষ্টাচার, (২) এ গ্রন্থে খৃস্টধর্ম বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহে বাইবেল এবং খৃস্টান পণ্ডিতদের লেখা যে সকল পুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন সেগুলির তথ্যাদি বর্ণনা, (৩) মীযানুল হক্ক ও অন্যান্য গ্রন্থে মি. ফান্ডারের মিথ্যাচার ও তথ্য-বিকৃতির নমুনা, (৪) ইসলামী গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় ড. ফান্ডার ও অন্যান্য খৃস্টান লেখকের তথ্য বিকৃতির রীতি, (৫) পরধর্ম আলোচনায় খৃস্টান পাদরিদের অসহিষ্ণুতা, নোংরা গালাগালি ও অপমানজনক শব্দাদি ব্যবহারের রীতি এবং এ সকল বিষয় বর্জন করার বিষয়ে গ্রন্থকারের ইচ্ছা, (৬) বাইবেলীয় নবীগণের বিষয়ে বাইবেলে উল্লিখিত ঘৃণ্য পাপের বর্ণনা ও উদ্ধৃতি উল্লেখের বিষয়ে মূলনীতি, (৭) ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের বিষয়ে পাদরি মহাশয়গণের গালভরা দাবি ও প্রকৃত মূর্খতার নমুনা।

(খ) প্রথম অধ্যায়: বাইবেল পরিচিতি। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। অধ্যায়টিকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বাইবেলের স্বীকৃত, বিতর্কিত ও সন্দেহযুক্ত পুস্তকাদির নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সকল পুস্তকের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন খৃস্টান গবেষকর দেওয়া তথ্য ও মতামতের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, অধিকাংশ পুস্তকের লেখক বা সংকলকের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। যাদের নামে এগুলি প্রচালিত তারা এগুলি লিখেছেন বলেও প্রমাণিত নয় এবং লেখক থেকে পরবর্তী কয়েক শত বা কয়েক হাজার বৎসর পর্যন্ত এর কোনো বর্ণনা সূত্র পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির মধ্যে বিদ্যমান অগণিত ভুল-ভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্যের আলোচনা করেছেন এবং বাইবেলের পুস্তকাদির মধ্যে বিদ্যমান ১২৫টি বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে পুরাতন নিয়ম থেকে ৪৫টি স্ববিরোধিতা বা বৈপরীত্যের নমুনা উল্লেখ করেছেন এবং অবশিষ্টগুলি নতুন নিয়ম থেকে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বাইবেল ঈশ্বরের বাণী কি না তা আলোচনা করেছেন। খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদের তথ্য ও বক্তব্যের আলোকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, খৃস্টানদের পক্ষে বাইবেলের সকল পুস্তক ওহী বা ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে লিখিত বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তিনি ১৭টি বিষয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্কে খৃস্টান পাদরিদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি বাইবেলের পুস্তকাদির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মতপার্থক্য উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমনের পূর্বেই প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল হারিয়ে গিয়েছে।

(গ) দ্বিতীয় অধ্যায়: বাইবেল বিকৃতি। এ অধ্যায়ে তিনি বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণ করেছেন। অধ্যায়টিকে তিনি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মূল শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বিকৃতির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এরূপ বিকৃতির ৩৫টি প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৩১টি প্রমাণ পুরাতন নিয়ম থেকে ও অবশিষ্ট ৪টি প্রমাণ নতুন নিয়ম থেকে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মূল বক্তব্যের মধ্যে অতিরিক্ত কথা সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বিকৃতির ৪৫টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ২৬টি পুরাতন নিয়ম থেকে ও বাকিগুলি নতুন নিয়ম থেকে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি মূল বক্তব্য

[৩০] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/১৮-২১; আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১০।

www.assunnahtrust.com

থেকে কিছু কথা বাদ দিয়ে বক্তব্যকে বিকৃত করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান এ জাতীয় বিকৃতির ২০টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ১৫টি পুরাতন নিয়ম থেকে ও ৫টি নতুন নিয়ম থেকে।

এরপর তিনি বাইবেলেই বিশুদ্ধতার দাবিতে যে সকল বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন কথা বলে খৃস্টান পাদরিগণ মুসলিমদেরকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেন সেগুলি আলোচনা করেছেন এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলিল-প্রমাণাদি দিয়ে তাদের এ সকল দাবি দাওয়ার অসারতা প্রমাণ করেছেন।

(ঘ) তৃতীয় অধ্যায়: রহিতকরণ। এ অধ্যায়ে তিনি রহিতকরণের বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। তিনি রহিতকরণের অর্থ ও ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া যুক্তি ও বিবেকের আলোকে আল্লাহর বিধান রহিত হওয়ার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর তিনি বাইবেলের বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি দিয়ে তার বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। বাইবেল থেকে প্রায় অর্ধ শত উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একই ভাববাদীর (নবীর) ব্যবস্থায় (শরীয়তে) আগের বিধান পরের নির্দেশ দ্বারা রহিত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ভাববাদী (নবী)-র শরীয়তের বিধান পরবর্তী ভাববাদীর শরীয়তে রহিত করা হয়েছে। ইহূদী ও খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের বিধিবিধান রহিত হওয়া অসম্ভব। তিনি তাদের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

(ঙ) চতুর্থ অধ্যায়: ত্রিত্ববাদ খণ্ডন। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার ত্রিত্ববাদের অসারতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেছেন। অধ্যায়টিকে তিনি ১টি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। ভূমিকায় তিনি ত্রিত্ববাদ ও যীশুর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে খৃস্টানদের বিশ্বাস আলোচনার ক্ষেত্রে ১২টি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি যীশুর বক্তব্যের দ্বারা ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তিনি যীশুর ১২টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলি সুস্পষ্টভাবে ত্রিত্ববাদকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি যীশুর ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদের স্বপক্ষে ত্রিত্ববাদীরা বাইবেলের যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করেন সেগুলির আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে এ সকল উক্তির কোনোটিই দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নয়। বরং অন্যান্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের আলোকে এগুলির সঠিক অর্থ ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ করে।

(চ) পঞ্চম অধ্যায়: কুরআনের অলৌকিকত্ব। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী এবং কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের জবাব দিয়েছেন। অধ্যায়টিকে তিনি চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বারটি সুস্পষ্ট বিষয়ের আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপ-প্রচারের উত্তর প্রদান করেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সংরক্ষিত সহীহ হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি হাদীসের বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তি ও অপ-প্রচারের উত্তর প্রদান করেছেন।

(ছ) ষষ্ঠ অধ্যায়: মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুয়ত। এ অধ্যায়ে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) নবুয়ত প্রমাণ করেছেন এবং এ বিষয়ক সন্দেহ ও বিভ্রান্তি অপনোদন করেছেন। তিনি অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুয়তের প্রমাণ আলোচনা করেছেন। ৬ দিক থেকে তিনি তা প্রমাণ করেছেন: (১) তাঁর অলৌকিক কর্মসমূহ, (২) তাঁর অসাধারণ চরিত্র ও আচরণ, (৩) তাঁর শরীয়তের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, (৪) গ্রন্থ ও ব্যবস্থা বিহীন জাতির মধ্যে তাঁর আগমন, (৫) বিশ্বমানবতার প্রয়োজনের সময়ে তাঁর আগমন, (৬) বাইবেলে পূর্ববর্তী ভাববাদিগণ কর্তৃক তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন যৌক্তিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন এবং ষষ্ঠ বিষয়ে তিনি বাইবেল থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে ১৮টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যীশুর বিষয়ে বাইবেলের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী খৃস্টানগণ উল্লেখ করেন, সেগুলির চেয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন ও পরিচয় বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অনেক বেশি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিষয়ে পাদরিগণের উত্থাপিত অভিযোগ ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারগুলির জবাব প্রদান করেছেন।

কুরআন ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে পাদরিগণের উত্থাপিত আপত্তি ও অভিযোগগুলি খণ্ডণের ক্ষেত্রে আল্লামা রাহমাতুল্লাহর অসাধারণ বৈশিষ্ট বাইবেলের আলোকে অভিযোগ খণ্ডন ও তুলনামূলক আলোচনা। প্রতিটি আপত্তি তিনি বাইবেলের সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন। এছাড়া তিনি পাদরিগণের প্রত্যেক অভিযোগের বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তারা কুরআন এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করেন সেগুলির প্রত্যেকটি আপত্তি ও অভিযোগ বাইবেল, যীশুখৃস্ট ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য। যেমন পাদরিগণ জিহাদের কারণে ইসলাম ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে অভিযুক্ত করেন, অথচ বাইবেলের মধ্যে গণহত্যা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাসীদের হত্যা ও নির্যাতন ও জাতিগত বিদ্বেষের অগণিত নির্দেশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পাদরিগণ বহুবিবাহের কারণে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, অথচ বাইবেলের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ ছাড়াও যীশু ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদীর জীবনে নারীঘটিত অনেক কলঙ্ক ও অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তুর্কি খলীফার উদ্যোগে মূল 'ইযহারুল হক্ক' গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ খৃস্টানদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তারা সুসংগঠিতভাবে চেষ্টা করতে থাকেন, বইটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে। এর মুদ্রিত কপিগুলি তারা বাজার থেকে ক্রয় করে নষ্ট করে ফেলতে থাকেন; যেন কোনো মুসলিম বা খৃস্টান সাধারণ পাঠকের হাতে তা না পৌঁছায়। তবে, পুস্তকটির

www.assunnahtrust.com

প্রকাশ ও প্রচারের বিষয়ে তুর্কি খলীফা ও প্রশাসনের বিশেষ মনোযোগ থাকার কারণে তাদের এই অপচেষ্টা পুরোপুরি সফলতা লাভ করতে পারে না।[৩১]

গ্রন্থটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে 'লন্ডন টাইমস' (London Times) পত্রিকায় বইটির বিষয়ে মন্তব্য করে বলা হয়, মুসলিমগণ যদি এই পুস্তকটি পাঠ অব্যাহত রাখে তবে মুসলিম সমাজে খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার চিরতরে থেমে যাবে। একজন মানুষও খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে না বরং সকলেই ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে।[৩২]

প্রকৃত অবস্থাও তাই হয়েছে। গ্রন্থটি অগণিত মুসলিম পাঠককে অভূতপূর্ব ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করেছে, অনেক অমুসলিম পাঠককে ঈমানের পথে অনুপ্রাণিত করেছে, অনেক মুসলিম গবেষককে গবেষণার প্রেরণা ও তথ্য প্রদান করেছে এবং সর্বোপরি এ গ্রন্থ অনেক পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেছে খৃস্টান মিশনারি ও পাদরিদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমকালীন প্রসিদ্ধতম ইসলাম প্রচারক ও তার্কিক আহমদ দীদাত (রাহ)। তিনি কাকতালীয় ভাবে এই পুস্তকটি পাঠ করার সুযোগ পান। এই পুস্তকই খৃস্টান প্রচারকদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হতে তাকে অভুতপূর্ব প্রেরণা এবং অজেয় জ্ঞানের অস্ত্র প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি এক স্থানে বলেন, "My discovery of the book 'IZHARUL HAQ' was the turning point in my life. After a short while I was able to invite the trainee missionaries of Adams Mission College and cause them to perspire under the collar until they developed a respect for Islam and its Holy Apostle."[৩৩]

মসি, অসি ও জিহ্বার মুজাহিদ আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবীকে মহান আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাতের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং তাঁর গ্রন্থাবলি, বিশেষত মহামূল্যবান 'ইযহারুল হক্ক' গ্রন্থটি পৃথিবীর সকল সত্য-সন্ধানীর হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। আমীন।

www.assunnahtrust.com

[৩১] ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৭৪।
[৩২] আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আনসারী, প্রাগুক্ত ২/১৫; ড. মালকাবী, প্রাগুক্ত, ১/৭৪।
[৩৩] Ahmed Deedat, IS THE BIBLE GOD'S WORD (Riyadh, International Islamic Publishing House), p 62.

www.assunnahtrust.com